১৩ তম বর্ষ ২০১১

ক্ষয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

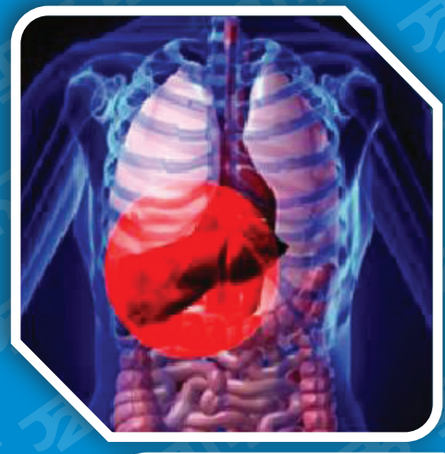

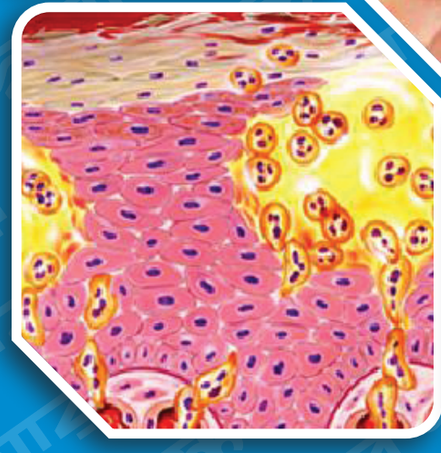

- হেপাটাইটিস
- সোরিয়াসিস
- একলাম্পসিয়া
- ডায়াবেটিস প্রতিরোধ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

ক্ষয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী
শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সেবায় নিবেদিত কর্মীদের জন্য প্রকাশিত

ISSN 1682-0541

সূচী

হেপাটাইটিস ১
সোরিয়াসিস ৫
একলাম্পসিয়া ৮
ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ১২
কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ ১৫

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

বাংলা 'স্কয়ার' এর ২০১১ সালের সংখ্যাটি আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। বর্তমান সংখ্যায় বহুল আলোচিত "হেপাটাইটিস" সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া 'সোরিয়াসিস', 'একলাম্পসিয়া' এবং 'ডায়াবেটিস প্রতিরোধ' প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আমাদের নিয়মিত বিভাগে কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

প্রতিবারের মত বর্তমান সংখ্যাটিও আপনাদের সবার ভালো লাগবে এবং কাজে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে খুশি হব। আপনাদের মতামত আমাদের বাংলা 'স্কয়ার' এর উত্তরোত্তর উন্নতিতে সহায়তা করবে।

সবশেষে 'স্কয়ার' পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

১৩তম বর্ষ, ২০১১

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

ডা: ওমর আকরাম-উর রব

নির্বাহী সম্পাদক

ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

বিশেষ সহযোগিতায়

ডাঃ এ.এস.এম. শওকত আলী
ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী
ডাঃ রেজাউল হাসান খান
প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1681-5552
Key title: The square (Dhaka)
Abbreviated key title: Square (Dhaka)

হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস বলতে লিভার (Liver) বা যকৃতের প্রদাহকে বুঝায়। বহুল পরিচিত এ রোগটি যে কোন বয়সে, যে কারো হতে পারে। অনেক কারণে হেপাটাইটিস হতে পারে। লিভারে প্রদাহ হলেই জন্ডিস হয় না। হেপাটাইটিসের যে সকল কারণে জন্ডিস দেখা দেয় তা হল ঃ

(ক) ভাইরাস জনিত
(খ) বিপাক জনিত
(গ) ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থের কারণে
(ঘ) এ্যালকোহল বা মদ্যপানের কারণে
(ঙ) অটোইমিউন (Autoimmune)

উল্লেখিত কারণগুলোর মধ্যে ভাইরাসের কারণে হেপাটাইটিস সবচেয়ে বেশী হয়। উন্নত বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নশীল দেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে হেপাটাইটিসের প্রকোপ অনেক বেশী। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ব্যক্তি জীবনের কোন-না-কোন সময়ে 'এ' এবং 'ই' ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেশের প্রায় ৭.৫ শতাংশ ব্যক্তির দেহে 'বি' ভাইরাসের জীবানু রয়েছে। আবার 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ। আর শিশুদের দেহে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় 'এ' ভাইরাস। দেশে যত মানুষ জন্ডিসে আক্রান্ত হন তার সিংহ ভাগই ভাইরাসের কারণে হয়। বিশ্বে এইডস নিয়ে আতংকের শেষ নেই। অথচ হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের সংক্রমন ক্ষমতা এইডস ভাইরাস থেকে ১০০ গুন বেশী।

ভাইরাল হেপাটাইটিস ঃ

ভাইরাল হেপাটাইটিস স্বল্পস্থায়ী (Acute) অথবা দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) হতে পারে। স্বল্পস্থায়ী হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত যকৃত (Liver) অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসে। কিন্ত দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত ব্যক্তি সারা জীবন ভাইরাসের সংক্রমন বহন করে থাকে এবং যকৃত পর্যায়ক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে লিভার সিরোসিস (Liver cirrhosis), লিভার ফেইল্যুর (Liver failure) এমনকি লিভার ক্যান্সার (Liver cancer) হতে পারে। যে সকল ভাইরাস ভাইরাল হেপাটাইটিস এর জন্য দায়ী তাদেরকে হেপাটোট্রপিক ভাইরাস বলে। এগুলো হচ্ছে-

হেপাটাইটিস 'এ' (Hepatitis A virus)
হেপাটাইটিস 'বি' (Hepatitis B virus)
হেপাটাইটিস 'সি' (Hepatitis C virus)
হেপাটাইটিস 'ডি' (Hepatitis D virus)
হেপাটাইটিস 'ই' (Hepatitis E virus)

এছাড়াও যেসব ভাইরাস ভাইরাল হেপাটাইটিস করে থাকে সেগুলো হলো ঃ হারপেস সিম্প্লেক্স (Herpes simplex),

পৃথিবীব্যাপী হেপাটাইটিস 'বি' এর বিস্তার

সাইটোমেগালো ভাইরাস (Cytomegalo virus), এপস্টেন-বার ভাইরাস (Epstein-Barr virus) অথবা ইউলো ফিভার (Yellow fever) ভাইরাস ।

ভাইরাল হেপাটাইটিস-এর উপসর্গ ঃ

- ❑ খাবারে অরুচি (Loss of appetite)
- ❑ বমি বমি ভাব (Nausea)
- ❑ বমি (Vomiting)
- ❑ দুর্বলতা (Weakness)
- ❑ অবসাদগ্রস্থতা (Tiredness)
- ❑ পেটে ব্যাথা (Aching in the abdomen)
- ❑ হলুদ/গৌর বর্ণ প্রস্রাব (Dark urine)

তবে কখনো কখনো ভাইরাল হেপাটাইটিস আক্রান্ত ব্যক্তির কোন উপসর্গ নাও দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ

সাধারণত রোগের উপসর্গ, লক্ষণ এবং রক্ত পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়। রক্ত পরীক্ষার মধ্যে বিলিরুবিন, লিভার এনজাইম (Liver enzymes) ভাইরাল এন্টিবডি (Viral antibody) ইত্যাদি দেখে রোগ নির্ণয় করা হয়।

চিকিৎসা ঃ

স্বল্পস্থায়ী (Acute) এবং দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) ভাইরাল হেপাটাইটিসের চিকিৎসা ভিন্ন ভিন্ন। স্বল্পস্থায়ী হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর চিকিৎসা এবং তরলজাতীয় খাবারের পাশাপাশি বিশ্রাম দেয়া হয়। দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস -এ ভাইরাসের বিস্তার নিরোধক জাতীয় ওষুধ দেয়া হয় এবং যকৃত যেন আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেই চিকিৎসা দেয়া হয়। দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস-এ এ্যালকোহল সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে বলা হয়। তা নাহলে যকৃত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এমনকি 'লিভার সিরোসিস' হতে পারে।

এ পর্বে আমরা হেপাটাইটিস 'বি' এবং হেপাটাইটিস 'সি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

হেপাটাইটিস 'বি' ঃ

হেপাটাইটিস ভাইরাসের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ভাইরাস হলো হেপাটাইটিস 'বি'। ইহা স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী দুই ধরণের ভাইরাল হেপাটাইটিস করে থাকে। ইহার সংক্রমন এতোই ব্যাপক যে হেপাটাইটিস 'বি' এখন এক মূর্তমান বিশ্ব সমস্যা। পরিসংখ্যান দেখলেই এর ব্যাপকতা অনুধাবন করা যায়। সারা বিশ্বে দুই বিলিয়নেরও (দুই'শ কোটি) বেশী মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত। এছাড়া তিন'শ পঞ্চাশ মিলিয়ন (পঁয়ত্রিশ কোটি) মানুষ এই ভাইরাস দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী ভাইরাল

পরীক্ষা	যা লেখা হয়	কি বোঝায়
হেপাটাইটিস 'বি' সারফেস এন্টিজেন	এইচবিএস এজি	হেপাটাইটিস 'বি' আক্রান্ত বোঝায়। তা একিউট বা ক্রনিক দুইই হতে পারে
হেপাটাইটিস 'বি' সারফেস এন্টিবডি	এইচবিএস এবি বা এন্টি এইচবিএস	হেপাটাইটিস 'বি' এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বোঝায়। হেপাটাইটিস 'বি' হতে সুস্থ হয়ে ওঠা বা টিকা দেয়া দুইই হতে পারে।
হেপাটাইটিস 'বি' ই এন্টিজেন	এইচবি ই এজি	হেপাটাইটিস 'বি' এর বংশবৃদ্ধি বোঝায়
হেপাটাইটিস 'বি' কোর এন্টিজেন	এইচবিসি এজি বা এন্টি এইচবিসি	হেপাটাইটিস 'বি' আক্রান্ত বোঝায় কিন্তু কোন প্রতিরোধ নির্দেশ করে না
হেপাটাইটিস 'বি' ডিএনএ	এইচবিভি ডিএনএ	রক্তে কি পরিমান হেপাটাইটিস 'বি' আছে এবং কি হারে তা বংশ বিস্তার করছে

হেপাটাইটিস 'বি' এর রক্তের পরীক্ষা ও তার ব্যাখ্যা

হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস বা ক্রনিক ক্যারিয়ার-এ ভুগছে। প্রতিবছর প্রায় ছয় লাখ মানুষ হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারে পৃথিবীতে যত লোক মারা যায় তাদের ২৫ শতাংশই এই ভাইরাসে আক্রান্ত। হেপাটাইটিস 'বি' এইডস ভাইরাস (HIV) এর চেয়ে পঞ্চাশ থেকে একশগুন বেশী সংক্রামক। আশার কথা হচ্ছে একটু সচেতনতা ও কার্যকর ভ্যাকসিন নেয়ার মাধ্যমে এরকম একটি মারাত্মক ভাইরাসের হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে জন্মের এক বছরের মধ্যে যেসব শিশু HBV সংক্রমিত হয় তাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ। এক থেকে চার বছরের মধ্যে আক্রান্ত হলে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৩০ - ৫০ ভাগ। পরবর্তীতে এদের মধ্য থেকে শতকরা ২৫ ভাগ লোক লিভার সিরোসিস (Liver cirrhosis) বা লিভার ক্যান্সারে (Liver cancer) মারা যায়। আবার পূর্ণবয়স্ক (Adult) সুস্থ ব্যক্তি হেপাটাইটিস

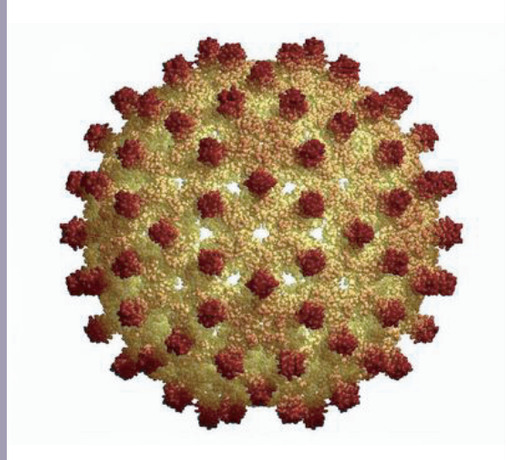

হেপাটাইটিস 'বি'

'বি' ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হলে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে পূর্বের ন্যায় সুস্থ অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে তাদের দেহ সম্পূর্ণভাবে ভাইরাসমুক্ত হয়ে যায়।

যেভাবে ছড়ায় ঃ

❑ সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শে এলে (Blood transfusion) ।

❑ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনে (Sexual contact)।

❑ জন্মের সময় আক্রান্ত মায়ের শরীর থেকে নবজাতকের শরীরে ছড়ায় (Perinatal) ।

❑ অনিরাপদ ইনজেকশন গ্রহণে (সাধারণতঃ মাদকসেবীদের ক্ষেত্রে) ।

তবে খাদ্য বা পানির মাধ্যমে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস ছড়ায় না।

যারা ঝুঁকিপূর্ণ ঃ

❑ অসুস্থতার কারণে যাদের প্রায়ই রক্ত বা রক্তের উপাদান গ্রহণ করতে হয়।

❑ ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবনকারী।

❑ আক্রান্ত ব্যক্তির যৌন সঙ্গী ।

❑ অবাধ যৌনচারী, সমকামী কিংবা বিকৃত যৌনচারী।

❑ স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী।

❑ প্যাথলজিক্যাল সেন্টার বা ব্লাড ব্যাংকে কর্মরত ব্যক্তি।

❑ যাদের দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়।

❑ যাদের হিমোডায়ালাইসিস করা হয়।

❑ আক্রান্ত মায়ের নবজাতক।

❑ ভ্রমনকারী বা পর্যটক (Tourist)।

চিকিৎসা ঃ

স্বল্পস্থায়ী হেপাটাইটিস 'বি' (Acute Hepatitis B)-র কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। সাধারণতঃ স্বল্পস্থায়ী হেপাটাইটিস 'বি' এমনিতেই ভাল হয়ে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী হেপাটাইটিস 'বি' (Chronic Hepatitis B) এর ক্ষেত্রে অ্যাডেফোভির (Adefovir), ইন্টারফেরন আলফা (Interferon Alfa), লেমিভুডিন (Lamivudine), অ্যান্টেকাভির (Antecavir), টেলবিভুডিন (Telbivudine) ইত্যাদি ওষুধ প্রয়োগে চিকিৎসা করা হয়।

হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস 'বি' : চিকিৎসা

প্রতিরোধ ঃ

হেপাটাইটিস 'বি' ভ্যাকসিন এই রোগের একমাত্র প্রতিরোধক। আশার কথা হচ্ছে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৭৭টি দেশ তাদের জাতীয় টিকাদান কর্মসূচীতে হেপাটাইটিস 'বি' ভ্যাকসিন সংযুক্ত করেছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

হেপাটাইটিস 'সি' ঃ

ইহাও স্বল্পস্থায়ী (Acute) এবং দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) দুই ধরণের ভাইরাল হেপাটাইটিস করে থাকে। স্বল্পস্থায়ী আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ লোক এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। বাকী শতকরা ৮৫ ভাগ লোক দীর্ঘস্থায়ী ভাইরাল হেপাটাইটিস 'সি' রোগে ভোগে। সারা বিশ্বে প্রায় তিন'শ মিলিয়ন (ত্রিশ কোটি) মানুষ হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত এ রোগের লক্ষণ অনেক সময় প্রকাশ পায় না। তবে দীর্ঘস্থায়ী ভাইরাল হেপাটাইটিস 'সি' পরবর্তীতে লিভার ফাইব্রোসিস (Fibrosis), সিরোসিস (Cirrhosis) এমনকি লিভার ক্যান্সার (Liver Cancer) করতে পারে।

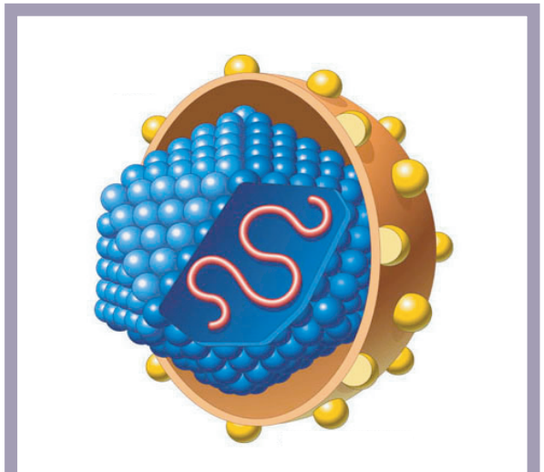

হেপাটাইটিস 'সি'

যেভাবে ছড়ায় ঃ

- ❑ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শে।
- ❑ অনিরাপদ ইনজেকশন গ্রহণে।
- ❑ বহুজনের একই সূঁচ ব্যবহারের মাধ্যমে।
- ❑ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ঠিকমত স্টেরিলাইজড (Sterilized) না হলে।

যারা ঝুঁকিপূর্ণ ঃ

- ❑ রক্ত বা রক্তের উপাদান গ্রহণকারী।
- ❑ সূঁচ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক সেবনকারী।
- ❑ হিমোডায়ালাইসিস সেন্টারের রোগী এবং কর্মরত ব্যক্তি।
- ❑ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে এবং ব্লাড ব্যাংকে কর্মরত ব্যক্তি।
- ❑ আক্রান্ত মায়ের নবজাতক।
- ❑ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন।

চিকিৎসা ঃ

পেগিলেটেড ইন্টারফেরন (Pegylated interferon) ও রিবাভিরিন (Ribavirin) দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা হয় যা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে নিতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

হেপাটাইটিস 'সি' প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত কোন ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং সাবধানতা ও সচেতনতাই এই ভাইরাস প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। তাছাড়া রক্ত এবং রক্তের উপাদান সঞ্চালনের আগে তা ভাইরাস মুক্ত কিনা পরীক্ষা করে নিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

- ❑ স্কয়ার

সোরিয়াসিস

সোরিয়াসিস এক ধরনের চর্মরোগ। এতে চামড়ার ওপরের কোষগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে রূপালী রঙের আঁশ ও লাল রঙের শুকনো, চুলকানো ছোপ তৈরী করে যা কখনো কখনো বেদনাদায়ক হতে পারে।

সোরিয়াসিস একটা দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) রোগ। এটা কখনো কমে, কখনো বাড়ে। কোন ক্ষেত্রে এটা কেবল অস্বস্তিকর, আবার কোন ক্ষেত্রে এটা জীবন বিপর্যস্তকারী, বিশেষ করে যখন আর্থ্রাইটিস সহযোগে হয়।

কোথায় হয় ঃ

সোরিয়াসিস সাধারণত মাথায়, নাভিতে, হাতের কনুই এবং হাঁটুতে, পিঠের নীচে স্যাকরামে (Secrum) হয়। হাত ও পায়ের নখ আক্রান্ত হতে পারে। শরীরের ডান ও বাম পাশ সমানভাবে (Symmetrical) আক্রান্ত হয়।

কারণ ঃ

সোরিয়াসিস পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। আমাদের দেশেও এ রোগ প্রচুর রয়েছে। এ রোগ কেন হয় তার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশী আক্রান্ত হয়। যে কোন বয়সে এ রোগ হতে পারে। তবে ৪ বৎসর বয়সের পূর্বে সাধারণতঃ এ রোগ হতে দেখা যায় না। মেয়েদের ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সে বেশী হয় এবং ঋতু বন্ধ হয়ে গেলে সাধারণতঃ হয় না। মারাত্মক অবস্থায় হাত ও পায়ের অস্থিসন্ধি আক্রান্ত হতে পারে যাকে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস (Psoriatic arthritis) বলে। যদিও প্রত্যক্ষ কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তবে অনেক সময় দেখা গেছে কতগুলো আনুষঙ্গিক কারণে এ রোগ খুব তাড়াতাড়ি দেখা যায়। সাধারণতঃ কোন জায়গায় আঘাত লাগলে, টিকা নিলে, কোন জন্তুতে কামড়ালে এমনকি সামান্য সূঁচের খোঁচা লাগলেও এ রোগ বাড়তে পারে (Koebner phenomena)।

অনেক সময় দেখা যায় অন্যান্য রোগে আক্রান্তের পর হঠাৎ এ রোগ দেখা দিয়েছে যেমনঃ জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টনসিলাইটিস, স্নায়োবিক দূর্বলতা, মানসিক দুশ্চিন্তা (Stress) ইত্যাদি।

মহিলাদের গর্ভাবস্থায় অথবা প্রসবের পর এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার এও দেখা গেছে, পুরাতন রোগী গর্ভাবস্থায় ভাল হয়ে যায় এবং প্রসবের পর আবার পূর্বের মতো রোগ দেখা দেয়। এ রোগ অনেক সময় বংশগত হতে পারে তবে এরূপ ইতিহাস কদাচিৎ পাওয়া যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে কিছু কিছু ওষুধ এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে যেমন ঃ উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ (Beta blockers, Calcium channel blockars, ACE inhibitors etc.), ম্যালেরিয়ার ওষুধ, রক্তের চর্বি কমানোর ওষুধ (Lipid lowaring agent) লিথিয়াম ইত্যাদি।

লক্ষণসমূহ ঃ

সোরিয়াসিসের লক্ষণসমূহ ব্যক্তিভেদে একেক রকম। তবে নীচের যে কোনটাই থাকতে পারেঃ

- ❑ চামড়ার ওপরে সুক্ষ্ম আঁশযুক্ত লালচে দানা দিয়ে শুরু হয়।
- ❑ লালচে দানার ওপর ধীরে ধীরে অনেকটা রূপালী রংয়ের আবরন পড়ে।
- ❑ শুকনো, ফাটা চামড়া - যা দিয়ে রক্তপাত হতে পারে।
- ❑ চুলকানী, জ্বালাপোড়া বা খসখসে ভাব।
- ❑ মোটা, গর্ত হওয়া বা দাগ পড়া নখ।
- ❑ ফোলা ও আটকে যাওয়া অস্থিসন্ধি।

সোরিয়াসিসের ছোপগুলো খুসকীর মত কিছু দাগ থেকে শরীরের বিশাল এলাকা জুড়ে থাকতে পারে। অধিকাংশ সোরিয়াসিস একটা সময় ধরে একইভাবে চলার পর, কিছু সপ্তাহ বা মাস পর পর বাড়ে কমে।

সোরিয়াসিস

সোরিয়াসিসের প্রকারভেদঃ

সেবোরিক সোরিয়াসিস (Seborrheic like psoriasis) ঃ এ ধরনের সোরিয়াসিস দেখতে মসৃণ ও লাল বর্ণের হয়। খোঁসাগুলো তুলনামূলকভাবে তৈলাক্ত ও নরম হয়।

ন্যাপকিন সোরিয়াসিস (Napkin psoriasis) ঃ ন্যাপকিন সোরিয়াসিস সাধারণত ২ থেকে ৮ মাস বয়সী শিশুদের হয় যারা নিয়মিত ডায়াপার ব্যবহার করে। প্রস্রাবে ভেজা ডায়াপার বেশী সময় থাকলে এ ধরণের সোরিয়াসিস দেখা দিতে পারে।

গ্যাটেট সোরিয়াসিস (Guttate psoriasis) ঃ গ্যাটেট সোরিয়াসিস সাধারণত ৩০ বৎসর বয়সের আগে হয়। এতে ২ থেকে ৫ মি.মি. ব্যাসার্ধের পানির ফোঁটার মতো ক্ষত হয়। শরীরের কিছু কিছু প্রদাহ বিশেষ করে Streptococcal pharyngitis এবং Severe upper respiratory infection এর পরে দেখা যায়।

প্লেক সোরিয়াসিস (Plaque psoriasis) ঃ এটাই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। চামড়ায় লাল ছোপ যা শুকনো, উচু ও রূপালী আঁশ দিয়ে আবৃত। এটা চুলকায় বা ব্যথা করতে পারে। এটা শরীরের যে কোন জায়গায় হতে পারে, এমনকি যৌনাঙ্গ ও মুখের ভেতরের নরম চামড়ায় এবং অস্থিসন্ধির কাছে । এ থেকে রক্তপাত হতে পারে।

প্লেক সোরিয়াসিস

নখের সোরিয়াসিস (Psoriasis of nail) ঃ হাত পায়ের নখে হতে পারে। এতে নখে গর্ত, অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও রঙিন হয়। নখ আস্তে আস্তে আলগা হয়ে পড়ে যেতে পারে।

মাথার সোরিয়াসিস (Psoriasis of scalp) ঃ মাথায় রূপালী আঁশ দিয়ে ঢাকা লাল রঙের হয় এবং এর সাথে চুলকানী থাকে।

মাথার সোরিয়াসিস

ইনভার্স সোরিয়াসিস (Inverse psoriasis) ঃ বগল, কুচকি, স্তনের নীচে ও যৌনাঙ্গের পাশে হতে পারে। এতে মসৃন, লাল, প্রদাহযুক্ত ত্বক দেখা যায়। মোটা ব্যক্তিদের বেশী হয় এবং ঘাম ও ঘষায় বাড়ে।

ইরাইথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস (Erythrodermic psoriasis) ঃ খুব কম দেখা যায়। এতে সারা শরীরে লাল, ফুলে ওঠা র‍্যাশ দেখা যায় যা খুব জ্বালাপোড়া করে।

সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস (Psoriatic arthritis) ঃ ত্বকের সোরিয়াসিসের সঙ্গে যে কোন গিরায় ব্যথা হয় ও ফুলে যায়। এতে চোখে প্রদাহ হতে পারে।

পাস্টুলার সোরিয়াসিস (Pustular psoriasis) ঃ কদাচিৎ হয়ে থাকে। সারা শরীর বা অল্প জায়গায় পুজ ভর্তি ফোড়া যা খুব দ্রুত হয়। এগুলো শুকিয়ে যায় এবং আবার ফিরেও আসতে পারে। এর সাথে জ্বর বা খুব চুলকানী হতে পারে।

জটিলতা ঃ

সোরিয়াসিস রোগীদের যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে, তা হলোঃ

- ত্বক পুরু হওয়া ও ইনফেকশন
- মানসিক অবসাদ ও বিষন্নতা
- সামাজিক সমস্যা

সোরিয়াসিস

পাস্টুলার সোরিয়াসিস

পরীক্ষা ঃ

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোরিয়াসিস সহজেই সনাক্ত করা যায়। শারীরিক পরীক্ষা ও রোগের ইতিহাসই এর জন্য যথেষ্ঠ। কোন কোন ক্ষেত্রে ত্বকের বায়োপসি (Biopsy) লাগতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

সোরিয়াসিসের চিকিৎসা প্রধানত তিন প্রকার। ত্বকে ব্যবহার করার ওষুধ, ফটোথেরাপী ও মুখে খাওয়ার ওষুধ।

ত্বকে ব্যবহার করার ওষুধ ঃ

মৃদু ও মাঝারী সোরিয়াসিস ত্বকে মলম দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। সোরিয়াসিস বেশী হলে এর সঙ্গে ফটোথেরাপী বা মুখের ওষুধ দেয়া হয়। ত্বকের মলমের মধ্যে আছে -

❑ ত্বকের কর্টিকোস্টেরয়েড:

সবচাইতে বেশী ব্যবহৃত ওষুধ যা মৃদু হতে মাঝারী সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এটা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। সংবেদনশীল ত্বক যেমন মুখ বা বেশী জায়গা জুড়ে কম মাত্রার কর্টিকোস্টেরয়েড দেয়া হয়। অল্প জায়গা বা কম মাত্রার কর্টিকোস্টেরয়েড কাজ না করলে বেশী মাত্রার কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে বেশী মাত্রার কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করলে ত্বক পাতলা হয়ে যেতে পারে বা চিকিৎসা অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।

❑ ভিটামিন ডি এনালগ:

কৃত্রিম ভিটামিন ডি ত্বকের কোষের বৃদ্ধি হ্রাস করে। এগুলো একা বা অন্য ওষুধের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

❑ ত্বকের রেটিনয়েড:

ভিটামিন 'এ' হতে পাওয়া যায়। এটা ব্যবহার করে রোদে বের হতে হলে সানস্ক্রীন ব্যবহার করতে হয়।

❑ স্যালিসাইলিক এসিড:

এটা মৃত কোষকে সরিয়ে দেয় ও আঁশ কমিয়ে দেয়। কর্টিকোস্টেরয়েড বা কোল টারের সঙ্গে ব্যবহার করলে এর ফলাফল বৃদ্ধি পায়।

❑ কোল টার:

সোরিয়াসিসের সবচেয়ে পুরনো চিকিৎসা। এর গন্ধ এবং শরীর ও কাপড়ে দাগ পড়ার জন্য এর ব্যবহার কম।

❑ ময়েশ্চারাইজার:

যদিও ময়েশ্চারাইজার সোরিয়াসিস কমায় না, কিন্তু চুলকানি বা শুকনো হওয়াকে কমায় বলে এর ব্যবহার আছে।

ফটোথেরাপী ঃ

এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

❑ প্রাকৃতিক রোদ:

প্রতিদিন নিয়ম করে অল্প পরিমান রোদ লাগালে উপকার হয়। কিন্তু বেশী কড়া রোদ ক্ষতি হতে পারে।

❑ কৃত্রিম ফটোথেরাপী:

যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করা হয়। অল্প বা বেশী, দুই ধরনের সোরিয়াসিসের জন্যই এটা ব্যবহার করা যায়।

মুখে খাওয়ার ওষুধ ঃ

মুখে খাওয়ার ওষুধগুলোর মধ্যে সাধারনত: রেটিনয়েড, মেথোট্রিক্সেট, সাইক্লোসপরিন ইত্যাদি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী দেয়া হয়।

সোরিয়াসিসে করনীয় ঃ

প্রতিদিন গোসল করা ।
ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা।
রোগাক্রান্ত এলাকা রাতে ঘুমাবার সময় ঢেকে রাখা।
অল্প সময়ের জন্য ত্বকে রোদ লাগানো।
মদ্যপান পরিহার করা।
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

একলাম্পসিয়া

গর্ভকালীন সময়ে খিঁচুনী একটি মারাত্মক সমস্যা। যে সব কারণে গর্ভাবস্থায় খিঁচুনী হতে পারে তা হলো ঃ

- ❑ একলাম্পসিয়া (Eclampsia)
- ❑ এপিলেপ্সি (Epilepsy)
- ❑ সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া (Cerebral malaria)
- ❑ মেনিন্‌জাইটিস (Meningitis)
- ❑ টিটেনাস (Tetanus)
- ❑ পারপেরিয়াল সেপসিস্ (Puerperal sepsis)

এর মধ্যে একলাম্পসিয়া গর্ভাবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যাতে মৃত্যুহার অনেক বেশী। এখানে একলাম্পসিয়া ও তার পূর্ববর্তী অবস্থা প্রি- একলাম্পসিয়া নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রি- একলাম্পসিয়া

প্রি-একলাম্পসিয়া এমন এক অবস্থা যাতে গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ এবং প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন বের হয়। সাধারনত: গর্ভবতী হবার ২০ সপ্তাহ পর এটা শুরু হয় ও বাচ্চা হবার ৬ সপ্তাহ পর অবস্থার উন্নতি হয়।

একলাম্পসিয়া

যাদের প্রি- একলাম্পসিয়া আছে তাদের খিঁচুনী বা অজ্ঞান হবার ঘটনা ঘটলে তাকে একলাম্পসিয়া বলে। এর ফলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী।

একলাম্পসিয়ায় খিঁচুনীর ধাপসমূহ -

একলাম্পসিয়ার খিঁচুনী অনেকটা এপিলেপ্সির খিঁচুনীর মতোই।

১. প্রিমনিটারি ধাপ ঃ

১০-২০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এ সময়-

- ❑ চোখ উল্টে বা স্থির হয়ে যায়।
- ❑ মুখ ও হাতের মাংশপেশীর খিঁচুনী হয়।

প্রি- একলাম্পসিয়ার লক্ষণ সমূহ ঃ

	মৃদু প্রি-একলাম্পসিয়া	গুরুতর প্রি-একলাম্পসিয়া
ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ	গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর দুই বার ৯০-১১০ মিমি মার্কারী পাওয়া গেলে	গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর দুই বার ১১০ মিমি মার্কারীর ওপর পাওয়া গেলে
প্রস্রাবে প্রোটিন	২+ পর্যন্ত	৩+ বা তার বেশী

প্রি- একলাম্পসিয়ার অন্যান্য লক্ষণ সমূহ ঃ

	মৃদু প্রি-একলাম্পসিয়া	গুরুতর প্রি-একলাম্পসিয়া
মাথা ব্যাথা	নেই	থাকতে পারে
চোখে ঝাপসা দেখা	নেই	থাকতে পারে
ওপরের পেটে ব্যাথা	নেই	থাকতে পারে
কম প্রস্রাব (২৪ ঘন্টায় ৪০০ মিলির কম)	নেই	২৪ ঘন্টায় ৪০০ মিলির কম
হাইপার রিফ্লেক্স	নেই	থাকতে পারে
ফুসফুসে পানি	নেই	থাকতে পারে

একলাম্পসিয়া

একলাম্পসিয়ার লক্ষণ সমূহ ঃ

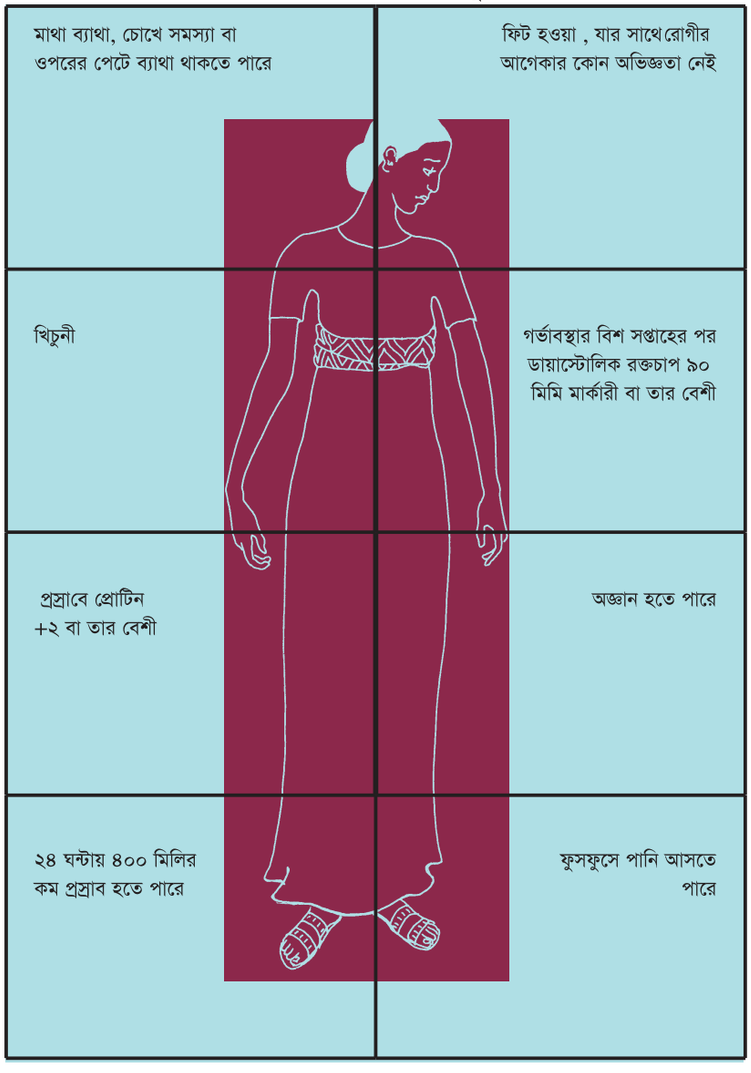

২. টনিক ধাপ ঃ

১০-২০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এ সময়-

- ❑ মুখ ও হাতের মাংশপেশীর খিঁচুনী হয় ।
- ❑ মাংশপেশীর ভয়ংকর ভাবে খিঁচুনী হয়।
- ❑ হাতের মুঠো শক্ত হয়ে বন্ধ থাকে এবং পা শক্ত হয়ে যায়।
- ❑ ডায়াফ্রাম, যা নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করে তা শক্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস- প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং চামড়া নীল হয়ে যায়।
- ❑ পিঠ বেকে যেতে পারে।
- ❑ দাঁত আটকে যায়।
- ❑ চোখ বেরিয়ে আসতে চায়।

৩. ক্লোনিক ধাপ ঃ

১-২ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়-

- ❑ মাংশপেশীর ভয়ংকর শক্ত ও নরম হয়ে খিঁচুনী হতে থাকে।
- ❑ বেশী থুতু হবার কারণে মুখে ফেনা উঠে যায় যা ফুসফুসে ঢুকে যেতে পারে
- ❑ গভীর, সশব্দ নিঃশ্বাস নেওয়া।
- ❑ মুখের চামড়ায় রক্ত জমে ফুলে ওঠে।

৪. কোমা ধাপ ঃ

এটা মিনিট হতে ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী হতে পারে। রোগী গভীর ভাবে অজ্ঞান থাকে ও জোরে জোরে শ্বাস নেয়। নীলচে ভাব কমে আসে কিন্তু মুখ ফোলা থাকে। এক বা দুই বার খিঁচুনী ঘটনার পরই মৃত্যুও হতে পারে।

একলাম্পসিয়ার ঝুঁকি ঃ

একলাম্পসিয়ার ঝুঁকি যাদের মধ্যে বেশী থাকে, তা হলো -

- ❑ প্রথম মাতৃত্ব (বিশেষত কিশোরী মা ও ৩৫ বছরের বেশী বয়স্ক মা)।
- ❑ অতিরিক্ত ওজন।
- ❑ উচ্চ রক্তচাপ।
- ❑ বহু মাতৃত্ব।
- ❑ একাধিক ভ্রুন

এবং যে সব মহিলাদের নীচে বর্ণিত সমস্যাগুলো আছে। যেমন -

- ❑ ডায়াবেটিস (Diabetes)।
- ❑ হাইডাটিডিফর্ম মোল (Hydatidiform mole)।
- ❑ পলিহাইড্রামনিয়স (Polyhydramnios)।
- ❑ হাইড্রোপস ফিটালিস্ (Hydrops fetalis)।

একলাম্পসিয়ার কারণসমূহ ঃ

একলাম্পসিয়ার কারণ এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে গবেষকরা নিচের কারণসমূহ এর জন্য দায়ী বলে মনে

করেন:

- ❑ রক্তনালী সমূহের সমস্যা।
- ❑ স্নায়ুতন্ত্রের উপাদান সমূহের সমস্যা।
- ❑ জীন্।
- ❑ খাদ্য বা পথ্য বিশেষ।

চিকিৎসা ঃ

প্রি-একলাম্পসিয়া ও গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ দ্রুত সনাক্ত করার জন্য গর্ভাবস্থায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা জরুরী বিশেষত গর্ভাবস্থার শেষভাগে।

প্রতিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় রক্তচাপ মাপতে হবে, এবং যদি ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিমি মার্কারীর বেশী হয় তবে প্রস্রাবে প্রোটিন আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি রক্তচাপ বেশী থাকে, তাহলে রোগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে। যদি প্রস্রাবে প্রোটিন দেখা যায় তবে রোগীকে এমন হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে যেখানে একলাম্পসিয়ার চিকিৎসা সম্ভব।

গর্ভাবস্থার উচ্চ রক্তচাপ ঃ

যদি শুধুমাত্র ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০-১১০ মিমি মার্কারীর মধ্যে থাকে এবং প্রস্রাবে কোন প্রোটিন না থাকে তবে প্রতি সপ্তাহে রোগীকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রতিবার যা দেখতে হবে -

- ❑ রক্তচাপ মাপা, প্রস্রাবে প্রোটিন ও গর্ভস্থ বাচ্চার অবস্থা
- ❑ কোন গুরুতর মাথা ব্যাথা, চোখে ঝাপসা দেখা ও পেটে ব্যাথা আছে কিনা

রোগী ও তার পরিবারকে প্রি- একলাম্পসিয়ার খারাপ লক্ষণগুলো সম্পর্কে জ্ঞানদান ও করনীয় ঃ

যদি রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে বা অন্য কোন সমস্যা দেখা না যায়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবে বাচ্চা হবে।

যদি রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, বা প্রস্রাবে প্রোটিন চলে আসে অথবা বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় প্রি- একলাম্পসিয়ার চিকিৎসা দিতে হবে।

মৃদু প্রি- একলাম্পসিয়া ঃ

যদি গর্ভাবস্থা ৩৭ সপ্তাহের কম হয়, যদি সব লক্ষণগুলো অপরিবর্তিত থাকে, প্রতি সপ্তাহে দু'বার করে বর্হিবিভাগে দেখতে হবে -

- ❑ রক্তচাপ, প্রস্রাবের প্রোটিন, রিফ্লেক্স ও গর্ভস্থ বাচ্চার অবস্থা
- ❑ মাকে অতিরিক্ত বিশ্রাম নেবার পরামর্শ
- ❑ স্বাভাবিক খাদ্য
- ❑ কোন ধরনের উচ্চ রক্তচাপ, খিঁচুনী, প্রস্রাব বাড়ানো বা ঘুমের ওষুধ দেবার দরকার নেই

যদি বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হবার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে, সময়ের আগেই বাচ্চা ডেলিভারীর চিন্তা করা যেতে পারে।

যদি প্রস্রাবে প্রোটিনের পরিমান বেড়ে যায় তবে, গুরুতর প্রি-একলাম্পসিয়া হিসাবে চিকিৎসা করতে হবে।

যদি গর্ভাবস্থা ৩৭ সপ্তাহের বেশী হয়, বাচ্চা স্বাভাবিক অথবা সিজার ডেলিভারীর চিন্তা করতে হবে।

গুরুতর প্রি- একলাম্পসিয়া ও একলাম্পসিয়া ঃ

একলাম্পসিয়ার খিঁচুনী সন্তান জন্মানোর আগে, হবার সময় বা পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে হতে পারে। গুরুতর প্রি-একলাম্পসিয়ায় লক্ষণগুলো দেখা দেবার ২৪ ঘন্টা ও একলাম্পসিয়ার খিঁচুনী দেখা দেবার ১২ ঘন্টার ভেতর ডেলিভারী করা উচিত।

একলাম্পসিয়ার চিকিৎসার ছয়টি ধাপ আছে ঃ

১. শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখতে হবে এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিশ্চিত করতে হবে।

২. খিঁচুনী নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

৩. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে।

৪. নিবিড় পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে এবং শরীরে পানির পরিমান ঠিক রাখতে হবে।

৫. বাচ্চার ডেলিভারী করানো।

৬. জটিলতাগুলো সনাক্তকরন ও তার চিকিৎসা।

একলাম্পসিয়া

১. শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখা এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিশ্চিত করা ঃ

এটা করতে হলে -

❑ রোগীকে বাম দিকে কাত করে শোয়াতে হবে, যাতে বমি, রক্ত বা অন্য তরল ফুসফুসে না যায়।

❑ প্রতি খিঁচুনীর পর পাঁচ মিনিট বা তার বেশী অক্সিজেন দিতে হবে।

❑ প্রতি খিঁচুনীর পর মুখ ও গলা পরিষ্কার করতে হবে।

২. খিঁচুনী নিয়ন্ত্রন করা ঃ

খিঁচুনী নিয়ন্ত্রন করতে হলে এর জন্য নির্দেশিত ওষুধ দিতে হবে। ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দিয়ে তা করা উচিত। যদি তা না পাওয়া যায় তবে ডায়াজিপাম দেয়া যেতে পারে, যদিও তাতে বাচ্চার ক্ষতির আশংকা থাকে। তবে একবার ব্যবহারে বাচ্চার খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয়।

৩. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা ঃ

যদি ডায়াস্টোলিক উচ্চ রক্তচাপ ১১০ এর বেশি থাকে তবে তা নিয়ন্ত্রনে আনতে ওষুধ দিতে হবে। ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০-১১০ এর মধ্যে রাখতে হবে যাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ না হয়। এই ক্ষেত্রে হাইড্রাল্‌জিন ব্যবহার করা ভাল।

৪. নিবিড় পর্যবেক্ষন ঃ

যে কোন উত্তেজনা যেমনঃ জোরে শব্দ, জোরালো আলো এবং নড়াচড়া নুন্যতম পর্যায়ে রাখতে হবে। রোগীকে সিঙ্গেল কেবিনে, শান্ত পরিবেশে রাখতে হবে কিন্তু কখনোই একলা রাখা যাবে না।

শুধুমাত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় সেবা দিতে হবে। যার ভেতর আছে -

❑ প্রতি দুই ঘন্টা পরপর পাশ ফেরাতে হবে।

❑ মুখের যত্ন (মুখে কোন তরল দেয়া যাবে না)।

❑ ইউরিনারি ক্যাথেটার দিয়ে প্রস্রাব পরিমাপ।

৫. বাচ্চার ডেলিভারী ঃ

রোগীর অবস্থার উন্নতি হবার সাথে সাথে বাচ্চার ডেলিভারী করাতে হবে, তার বয়স যত সপ্তাহই হোক। গুরুতর প্রি-একলাম্পসিয়ায় লক্ষণ দেখা দেবার ২৪ ঘন্টা ও একলাম্পসিয়ার খিঁচুনী দেখা দেবার ১২ ঘন্টার ভেতর ডেলিভারী করা উচিত।

৬. জটিলতাগুলো সনাক্তকরন ও তার চিকিৎসা ঃ

❑ ডেলিভারীর পর কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পর্যবেক্ষনে রাখতে হবে।

❑ ডেলিভারীর পর অথবা শেষ খিঁচুনীর পর কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা খিঁচুনীর ওষুধ দিতে হবে।

❑ ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১১০ এর নীচে না আসা পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ দিতে হবে।

❑ সিঙ্গেল, নির্জন কেবিনে রোগীকে সার্বক্ষনিক সঙ্গীসহ রাখতে হবে।

❑ প্রস্রাব খুব সর্তকতার সাথে মাপতে হবে। এসময় স্যালাইন খুব হিসাব করে দিতে হবে।

রোগী সুস্থ হলে বাড়ীতে পাঠাতে হবে ও ৬ সপ্তাহ পর আবার দেখতে হবে।

একলাম্পসিয়া থেকে রেহাই পাবার উপায় ঃ

একলাম্পসিয়া প্রতিরোধের জন্যে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, গর্ভকালীন নিয়মিত চেকআপ এবং সময়োপযোগী চিকিৎসা। এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। একলাম্পসিয়া হঠাৎ করে শুরু হয় না। প্রি-একলাম্পসিয়া থেকে একলাম্পসিয়া হয়। কাজেই প্রি-একলাম্পসিয়া বা কিছুটা প্রাথমিক অবস্থা থেকে এর চিকিৎসা গ্রহণ করলে একলাম্পসিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। এছাড়া স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে একজন মাকে বুঝতে হবে যে সে কখন একলাম্পসিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং কখন তার চিকিৎসা প্রয়োজন। গর্ভকালীন মাকে নিয়মিত চেকআপ করানো। এই চেকআপ সন্তান গর্ভের আসার পর থেকে প্রতিমাসে একবার করে সাত মাস পর্যন্ত, এরপর প্রতি দুই সপ্তাহ পর পরবর্তী সময় থেকে একবার করে চেকআপ করতে হবে। এর মাধ্যমে মা-শিশুর মৃত্যুর হার অনেক কমে আসবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ

ডায়াবেটিস - চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ রোগকে বলে ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এটি একটি বিপাক ক্রিয়ার

ব্যাঘাত (Metabolic disorder) জনিত অসুখ। এটা এমন একটি শারীরিক অবস্থা যখন ইনসুলিনের অনুপস্থিতি বা অপর্যাপ্ততা অথবা ত্রুটিপূর্ণ ইনসুলিনের কাজের ফলে রক্তে দীর্ঘস্থায়ীভাবে শর্করার পরিমান স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে যায়। রক্তে শর্করার পরিমান বেশী হলে পরবর্তিতে তা প্রস্রাবের সাথে বের হতে থাকে। ডায়াবেটিস মূলত ২ প্রকার। টাইপ-১ বা ইনসুলিন নির্ভর (IDDM) এবং টাইপ-২ বা ইনসুলিন অনির্ভর (NIDDM)। আশঙ্কার কথা সারা বিশ্বে তথা আমাদের দেশেও এই রোগ ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। সাধারনত বংশানুক্রম (Genetic factor) অথবা পরিবেশগত (Enviromental factor) কারণে ত্রুটিপূর্ণ ইনসুলিন অথবা ইনসুলিনের স্বল্পতা বা অনুপস্থিতি দেখা যায়।

ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধ ঃ

অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে টাইপ টু ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা রোগ শুরু হওয়াকে বিলম্বিত করা যায় এবং ডায়াবেটিসের জটিলতা গুলোকেও প্রতিরোধ বা বিলম্বিত করা যায়। যাদের ডায়াবেটিস হবার ঝুঁকি আছে এমন রোগীকে চিহ্নিত করতে হবে খুব গুরুত্বের সাথে। সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল জীবন যাত্রার পরিবর্তন যেমন - ওজন কমানো, শারীরিক পরিশ্রম বাড়ানো এবং খাদ্যাভাস পরিবর্তন ইত্যাদি।

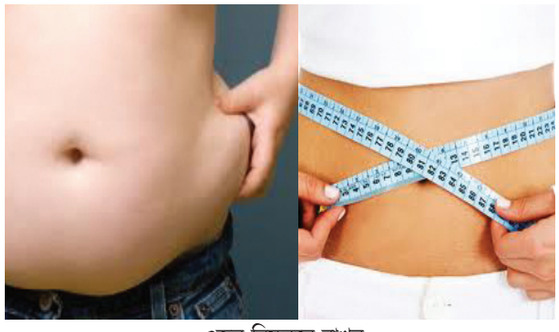

ওজন নিয়ন্ত্রনে রাখুন

ডায়াবেটিস রোগ আমরা তিন স্তরে প্রতিরোধ করতে পারি ঃ

(১) প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ ঃ

প্রাথমিক প্রতিরোধ হল ব্যাধিগ্রস্থতা ও ডায়াবেটিস শুরু হওয়াকে প্রতিরোধ করা। প্রাথমিক প্রতিরোধ দুই ভাবে করা যায় -

ক) জনগোষ্ঠির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ

১) ব্যাপক জন সচেতনতা তৈরী করা যায় নিম্নভাবে -

❑ ডায়াবেটিস রোগের মৌলিক তথ্যগুলো পাঠ্য বইয়ে সংযোজন।

❑ সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য প্রচার।

২) ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকিপূর্ণ কারন সমূহকে প্রতিরোধ করা যায় নিম্নভাবে -

❑ শারীরিক ব্যায়াম করার ক্ষেত্র তৈরী করা যেমন - ব্যায়ামাগার, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।

❑ খাদ্যাভাসের পরিবর্তন এবং ফাস্ট ফুডের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন

ফাস্টফুড পরিহার করুন

খ) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ঃ

❑ ঝুঁকিপূর্ণ কারনসমুহ বের করে তা প্রতিরোধোর ব্যবস্থা গ্রহন।

❑ জীবন যাত্রার পরিবর্তন যেমন - নিয়মিত ব্যায়াম করা, শর্করাযুক্ত খাবার কম খাওয়া, ওজন কমানো।

❑ প্রয়োজনে ওষুধের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কারণসমুহকে নিয়ন্ত্রনে রাখা।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ -

❑ যাদের মধ্যে ডায়াবেটিস হবার উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন কারন সমূহ বিদ্যমান তাদের প্রত্যেকের আইএফজি (IFG) বা আইজিটি (IGT) পরীক্ষা করা।

❑ যাদের আইএফজি বা আইজিটি আছে অথবা অতীতে জিডিএম (গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস) ছিল তাদের ওষুধ (মেটফরমিন অ্যাকারবোজ, গ্লিটাজোন) দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। এর সাথে জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে হবে।

টাইপ টু ডায়াবেটিস হবার জন্য যারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ (High-risk group) :

❑ যদি প্রি ডায়াবেটিস [ইম্পেয়ারড গ্লুকোজ টলারেন্স আইজিটি (IGT) বা ইম্পেয়ারড ফাস্টিং গ্লুকোজ আইএফজি (IFG) নামেও পরিচিত] থাকে।

❑ বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী হয়।

❑ যদি বাবা-মা বা ভাই বোনের ডায়াবেটিস থাকে (Family history of DM)।

❑ যদি গর্ভাবস্থায় কারও ডায়াবেটিস হয়ে থাকে (GDM)।

❑ জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ৯ পাউন্ডের বেশী হয়

❑ যদি কারও উচ্চ রক্তচাপ থাকে।

❑ যদি রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী থাকে।

❑ যদি বিএমআই (BMI)≥ ২৫ হয়।

❑ যদি কেউ শারীরিক পরিশ্রম কম করে বা সপ্তাহে তিনবারের কম ব্যায়াম করে (Sedentary life style)।

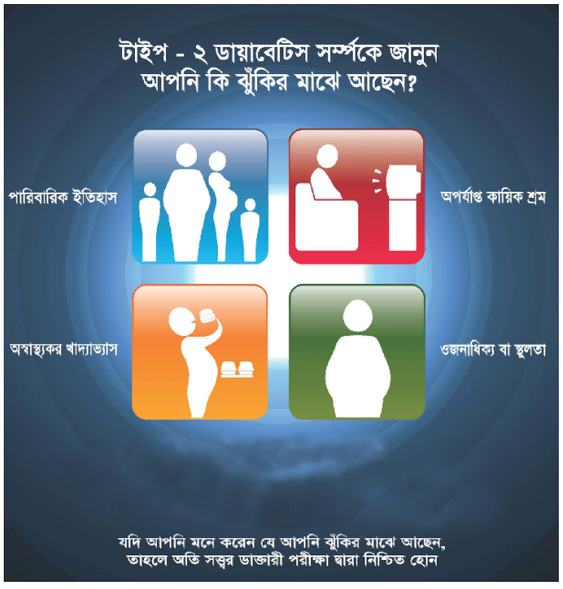

(২) মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ ঃ

মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ হল অতিশীঘ্র রোগ নির্ণয় করে জটিলতা হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে রোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

অতিশীঘ্র ডায়াবেটিস নির্ণয় করা যায়-যাদের ইনসুলিন অনির্ভরশীল ডায়াবেটিস (NIDDM) হবার ঝুঁকি আছে তাদের (যেমন-যাদের ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস আছে) ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা।

❑ সকল গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভাবস্থায় ২৪-২৮ সপ্তাহের মাঝে ডায়াবেটিস পরীক্ষার মাধ্যমে।

❑ যাদের বয়স ৪৫ বা ৪৫ এর উপরে সকল ব্যাক্তির রক্তের শর্করা পরীক্ষার মাধ্যমে। যদি কোন ব্যাক্তির রক্তের শর্করার পরিমান স্বাভাবিক থাকে তাহলে প্রতি তিন বছর পরপর রক্তের শর্করা পরীক্ষা করতে হবে।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ ঃ

এই পর্যায়ে প্রতিরোধ হলে বর্তমানে নিয়মিত ও স্থায়ী ডায়াবেটিস রোগীকে এ রোগের জটিলতা হতে নিবারন করা বা বিলম্বিত করা। সময়মত রোগের জটিলতা নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা করা।

জটিলতা নির্ণয় ঃ

টাইপ-১ ডায়াবেটিস: ডায়াবেটিস ১ম নির্ণয়ের সময়, তারপর ৫ বছর পর, অতঃপর প্রতি বছর পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিস এর জটিলতা নির্ণয় করতে হবে।

টাইপ-২ ডায়াবেটিস: ১ম নির্ণয়ের সময়, তারপর প্রতি বছর পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিস এর জটিলতা নির্ণয় করতে হবে।

এখন পর্যন্ত কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায়নি যে টাইপ-১ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা যায়। যদিও কিছু জিনগত ও পরিবেশগত নির্দেশক পাওয়া যায় কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। এই নির্দেশকগুলো দিয়ে কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা বাস্তব সম্মত নয়। সকল প্রকার ডায়াবেটিস এর মধ্যে টাইপ-২ ডায়াবেটিস সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। ইনসুলিনের প্রতি অসংবেদনশীল হওয়া থেকে আইজিটি, তারপর ডায়াবেটিস হওয়া এই ব্যাপারগুলো এখন সহজে বুঝা যায়। বয়স, বিএমআই(BMI), কোমর-হিপ অনুপাত (Waist-hip ratio), পারিবারিক ইতিহাস, জীবনযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিস এর অগ্রশীলতা চিহ্নিত করা যায়। তথ্য প্রমান আছে যে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা রোগ শুরু হওয়া বিলম্বিত করা যায় এবং ডায়াবেটিস এর জটিলতাগুলোকেও প্রতিরোধ বা বিলম্বিত করা যায়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন ও রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রন এর মাধ্যমে ডায়াবেটিস রোগীর মৃত্যু ও রোগাক্রান্ত হবার ঝুঁকি কমানো যেতে পারে। আরাম আয়েশ জীবনযাত্রার কুফলগুলো সম্পর্কে জনগনকে সতর্ক করতে পারলে ডায়াবেটিস রোগের অগ্রশীলতাকে যেমন কমানো যায় তেমনি তা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও লাভজনক। উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে রেটিনোপ্যাথি ও নেফ্রোপ্যাথি এর প্রবনতা কমানো সম্ভব। এছাড়া রক্তের লিপিড বা কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে হৃদরোগ, মস্থিষ্কের রক্তক্ষরন এবং অন্যান্য রক্তনালীর জটিলতা কমানো সম্ভব। ধুমপান বন্ধ করা, ওজন নিয়ন্ত্রনে রাখা এবং শারীরিক পরিশ্রম করা ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উপকারী। বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করার খরচ, ডায়াবেটিস এবং এর জটিলতাগুলোর চিকিৎসা খরচের চেয়ে অনেক কম। তাই ডায়াবেটিস এর জটিলতা গুলোকে প্রতিরোধ করা শুধুমাত্র রোগীর জন্যই লাভজনক নয় বরং দেশ ও সমাজের জন্যও লাভজনক।

ডায়াবেটিস রোগীদের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি অন্যান্য পদক্ষেপ যেমন রোগীকে ডায়াবেটিস এর জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং সতর্ক করার মাধ্যমে অন্ধত্ব, কিডনী রোগ, হৃদরোগ, মস্থিষ্কের রোগ, পা কাটা ইত্যাদির প্রবনতা কমানো সম্ভব। এজন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে টাইপ-২ ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে টিকার (Vaccine) সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

আসুন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রন করি এখনই।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ

এন্টিভা®
এডেফোভির ডিপিভক্সিল

এডেফোভির ডিপিভক্সিল, এডেফোভির এর একটি ডাই-এস্টার প্রোড্রাগ। ইহা হিউম্যান হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যক্ষম একটি অ্যাসাইক্লিক নিউকিওটাইড এনালগ।

উপাদান
এন্টিভা ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে এডেফোভির ডিপিভক্সিল আইএনএন ১০ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোকাইনেটিক ডাটা
১০ মি.গ্রা. একক মাত্রায় সেবন করা হলে এডেফোভির এর ওরাল বায়োঅ্যাভেইলেবিলিটি প্রায় ৫৯%। প্লাজমা অথবা সেরাম প্রোটিনের সাথে ইনভিট্রো বন্ধন <৪%। অ্যাকটিভ টিবিউলার সিক্রেশন এবং গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন এর মাধ্যমে এডেফোভির বৃক্ক দ্বারা নিষ্কাশিত হয়।

নির্দেশনা
ভাইরাল রেপ্লিকেশন এর প্রমাণ আছে এবং সেরামে এমিনোট্রান্সফারেজ (এএলটি), অ্যাসপারেট অ্যামিনোট্রান্সফারেজ (এএসটি) এর ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রমান আছে অথবা হিস্টোলজিক্যাল সক্রিয় রোগ আছে এমন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিস 'বি' এর চিকিৎসায় এন্টিভা নির্দেশিত।

মাত্রা ও সেবনবিধি
বৃক্কের কার্যক্ষমতা সম্পন্ন, ক্রনিক হেপাটাইটিস 'বি' এর রোগীদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১০ মি.গ্রা. একক মাত্রা, খাবার আগে বা পরে নির্দেশিত।

বৃক্ক অকার্যকরী রোগীদের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ৫০ মি.লি./মিনিট এর কম হলে এবং হিমোডায়ালাইসিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাবে এন্টিভা এর মাত্রার সমন্বয় করতে হবে।

ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স (মি.লি./মিনিট)	≤ ৫০	২০-৪৯	১০-১৯	হিমোডায়ালাইসিস এর রোগীদের ক্ষেত্রে
নির্দেশিত মাত্রা	১০ মি.গ্রা.	প্রতি ৪৮ ঘন্টায় ১০ মি.গ্রা.	প্রতি ৭২ ঘন্টায় ১০ মি.গ্রা	ডায়ালাইসিস এর পর প্রতি ৭ দিনে ১০ মি.গ্রা.

প্রতিনির্দেশনা
এডেফোভির ডিপিভক্সিল বা এর কোন উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা
যে সকল রোগী এডেফোভির ডিপিভক্সিল এর চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়মিত তাদের যকৃতের কার্যক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বৃক্কীয় সমস্যা রয়েছে অথবা হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন রোগীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে মাত্রার সমন্বয় করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার
প্রেগন্যান্সী ক্যাটাগরী সি- গর্ভবতী মায়েদের উপর এডেফোভির এর পর্যাপ্ত এবং নিয়ন্ত্রিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কেবল একান্ত প্রয়োজনেই, ঝুঁকি ও উপকারিতার মাত্রা বিবেচনা করে, গর্ভাবস্থায় এডেফোভির ডিপিভক্সিল ব্যবহার করা উচিত। এডেফোভির মাতৃদুগ্ধে নিঃসরিত হয় কিনা জানা যায়নি। মায়েরা যদি এডেফোভির গ্রহন করে থাকেন তাহলে তাদেরকে স্তন্যদান করানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার
১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এডেফোভির এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার
যেহেতু বিভিন্ন রোগ ও অন্যান্য চিকিৎসার কারনে বয়স্ক ব্যক্তিদের বৃক্ক ও কার্ডিয়াক ক্ষমতা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাই বয়স্ক রোগীদের এডেফোভির দেবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হল- দূর্বলতা, মাথাব্যথা, পাকস্থলীতে প্রদাহ এবং বমি বমিভাব। যে সকল রোগীর বৃক্কের অকার্যকারিতা রয়েছে অথবা হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এডেফোভির ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করা হলে তাদের নেফ্রোটক্সিসিটি হবার সম্ভাবনা থাকে।

ডার্মাসল®
ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট বিপি

উপাদান
ডার্মাসল ০.০৫% ক্রীম: প্রতি ১০ গ্রাম ডার্মাসল ক্রীমে আছে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট বিপি ৫ মি.গ্রা.।
ডার্মাসল ০.০৫% অয়েন্টমেন্ট: প্রতি ১০ গ্রাম ডার্মাসল অয়েন্টমেন্টে আছে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট বিপি ৫ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা
১। সব বয়সের রোগীদের হাইপারএকুইট এক্জিমার প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ
২। হাত ও পায়ের ক্রনিক হাইপারকেরাটোটিক এক্জিমা
৩। ক্রনিক হাইপারকেরাটোটিক সোরিয়াসিস
৪। তীব্র আলোক সংবেদনশীলতা
৫। একুইট কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস
৬। হাইপারট্রফিক লাইকেন প্লানাস
৭। লোকালাইজ বুলাস ডিসঅর্ডারস
৮। কেলয়েড স্কারিং
৯। প্রিটিবিয়াল মিক্সিডিমা
১০। ক্রায়োথেরাপির পর রিএ্যাকশন সাপ্রেসন

ব্যবহারবিধি ও মাত্রা
প্রদাহস্থানে দৈনিক একবার বা দুইবার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য শক্তিশালী টপিক্যাল স্টেরয়েডের মত প্রদাহের নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। যদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয় তাহলে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করে চার সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। ছোট কোর্সের ডার্মাসল পুনরাবৃত্তি করে প্রদাহের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ধারাবাহিকভাবে স্টেরয়েড চিকিৎসা প্রয়োজন হয় তাহলে একটি স্বল্প মাত্রার ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

খুবই অপ্রতিরোধ্য প্রদাহের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হাইপারকেরাটোসিসের ক্ষেত্রে, ডার্মাসলের প্রদাহবিরোধী ক্রিয়া পলিথিন ফিল্মের অবরোধক ব্যবহার করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পূর্ন রাতের অবরোধক ব্যবহারই ভাল ফলাফলের জন্য যথেষ্ট। তারপর অবরোধক ছাড়া ব্যবহার করে উন্নতি অব্যাহত রাখা যায়।

সতর্কতা ও যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না
১। ত্বকের সংক্রমণ যেমন- ইমপেটিগো, টিনিয়া করপোরিস এবং হার্পিস সিমপ্লেক্স
২। ইনফেস্টাশনসমূহ যেমন স্ক্যাবিস
৩। নবজাতক শিশু (এক বৎসরের কম বয়সের শিশু)
৪। একনি ভালগারিস
৬। গ্রাভিটেশনাল আলসারেসন

ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট দ্বারা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক চিকিৎসা এড়িয়ে চলা উচিত। বিশেষ করে নবজাতক এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এড্রিনাল সাপ্রেশন হতে পারে। যদি শিশুদের ক্ষেত্রে ক্লোবেটাসল প্রোপিওনেট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতি সপ্তাহে শিশুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, শিশুর ন্যাপকিন অবরোধক হিসাবে কাজ করতে পারে। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে শরীরের অন্যান্য স্থানের তুলনায় মুখে অ্যাট্রফিক পরিবর্তনসমূহ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মুখে প্রদাহের চিকিৎসা করার সময় এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে এবং রোগীদের বারবার পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
বয়স্কদের ক্ষেত্রে যদি সপ্তাহে ৫০ গ্রামের কম ব্যবহার করা হয়, তাহলে পিটুইটারী এড্রেনাল সাপ্রেশন হলে ব্যবহার বন্ধ করার পর ভাল হয়ে যায়। একথা শিশুদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবরোধক ব্যবহার করা হলে টপিকাল কর্টিকোস্টেরয়েডের শোষণ বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন বেশি মাত্রায় শক্তিশালী কর্টিকোস্টেরয়েড দ্বারা চিকিৎসা করা হলে অ্যাট্রোফিক পরিবর্তনসমূহ যেমন-সুপারফিসিয়াল রক্তনালীসমূহ পাতলা ও প্রসারিত হতে পারে, বিশেষ করে যেখানে অবরোধক ব্যবহার করা হয়।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার
গর্ভাবস্থায় ব্যবহার পরিহার করা উচিত। মায়েরা যদি বেশি পরিমাণে এ ওষুধ ব্যবহার করেন তাহলে বুকের দুধে নিঃসরণ সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে।

সংরক্ষণ
আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রৈমাসিক গর্ভকালীণ অবস্থায় ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট

- ৪৫-৭৪% প্রি-এক্লাম্পসিয়া এর ঝুঁকি কমায়
- গর্ভকালীণ মৃত্যুহার কমায়
- নবজাতকের হাড়ের মিনারেল এর পরিমাণ ১৫% বৃদ্ধি করে

ক্যালবো® ৫০০

ক্যালসিয়াম ৫০০ মি.গ্রা.

গর্ভকালীণ ও স্তন্যদানকালীণ ক্যালসিয়ামের বর্ধিত চাহিদা পূরণকারী

মাত্রা ও সেবনবিধি:
দিনে ২টি ট্যাবলেট (সকালে ও রাতে) খাবারের সাথে অথবা পরপর গ্রহণ করা শ্রেয়।

নেক্সাম®

ইসোমিপ্রাজল

পাকস্থলীর এসিড নিঃসরণ ২৪ ঘন্টা ধরে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে

- ওমিপ্রাজল এর কার্যকরী আইসোমার হচ্ছে ইসোমিপ্রাজল
- **GERD** নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর থেকে অধিক কার্যকরী
- **USFDA** অনুমোদিত প্রেগনেন্সি ক্যাটাগরি-বি

নেক্সাম® ২০ এবং ৪০ ট্যাবলেট
নেক্সাম® ২০ এবং ৪০ ক্যাপসুল
নেক্সাম® ৪০ আইভি ইঞ্জেক্শন

গাইনীপ্রো®

মেট্রোনিডাজল বিপি, নিওমাইসিন সালফেট বিপি,
পলিমিক্সিন বি সালফেট বিপি, নিস্টাটিন বিপি

দিনে একবার
ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরী

- সাদা স্রাব (লিওকোরিয়া)
- হলুদ স্রাব (ভ্যাজাইনাল ট্রাকোমোনিয়াসিস)
- ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জনিত ভ্যাজাইনাল প্রদাহে নির্দেশিত

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী **স্কয়ার** *১৩ তম বর্ষ, ২০১১*

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার্স: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন: ৮৮৩৩০৪৭-৫৬, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web Page : http://www.squarepharma.com.bd

Developed by: dhakahealth